মন্দ্রসপ্তক

হুমায়ূন আহমেদ

মন্দ্রসপ্তক

হুমায়ূন আহমেদ

সময় প্রকাশন

মন্দ্রসপ্তক
হুমায়ূন আহমেদ
© গুলতেকিন আহমেদ

সময় অষ্টম মুদ্রণ (১০ম মুদ্রণ) : এপ্রিল ২০১৬
সময় সপ্তম মুদ্রণ (৯ম মুদ্রণ) : এপ্রিল ২০১৪
সময় ষষ্ঠ মুদ্রণ (৮ম মুদ্রণ) : জুলাই ২০১০
সময় পঞ্চম মুদ্রণ (৭ম মুদ্রণ) : সেপ্টেম্বর ২০০৮
সময় চতুর্থ মুদ্রণ (৬ষ্ঠ মুদ্রণ) : নভেম্বর ২০০৪
সময় তৃতীয় মুদ্রণ (৫ম মুদ্রণ) : অক্টোবর ১৯৯৮
সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ (৪র্থ মুদ্রণ) : জুন ১৯৯৫
সময় প্রথম সংস্করণ (৩য় মুদ্রণ) : জুলাই ১৯৯৩
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯০

সময়
সময় ০৬৪

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
নূশা কম্পিউটার্স
আজিমপুর, ঢাকা ১২০৫

মুদ্রণ
অধুনা প্রিন্টার্স, সুকলাল দাস লেন, ঢাকা

মূল্য : ১০০.০০ টাকা মাত্র

MONDRASHOPTAK a Novel by Humayun Ahmed. Somoy First Edition : July 1993, Somoy 8th Print : April 2016 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka.
Website : www.somoy.com Email : info@somoy.com

Price : Tk. 100.00 Only.

ISBN 984-458-064-1 Code: 064

নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র : 'সময় . . .' প্লাজা এ. আর (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন) ধানমন্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন: ৯১১ ৬৮৮৫

সকালবেলাতেই মৃত্যু সংবাদ।

টুথব্রাসে পেস্ট মাখাচ্ছি। অস্বস্তি নিয়েই মাখাচ্ছি — কারণ কার ব্রাস ঠিক ধরতে পারছি না। এ বাড়িতে তিনটা সাদা রঙের টুথব্রাস আছে যার একটা আমার। সেই একটা মানে কোন্‌টা আমি কখনো ধরতে পারি না। বাকি দু'টার মালিক আমার দু'বোন। এদের চোখের দৃষ্টি ঈগলের মত তীক্ষ্ণ — এরা দূর থেকে বলতে পারে ব্রাসটা কার। এই কারণে দাঁত মাজার পর্বটা আমি সাধারণত অতি দ্রুত সেরে ফেলি। বোনদের চোখে পড়ার আগেই। এরা বড় যন্ত্রণা করে।

আজ আমার পরিকল্পনা ছিল ধীরে সুস্থে সব কাজকর্ম করা। দাঁত মাজার পর্বে মিনিট দশেক সময় দেবার কথা ভাবছিলাম। সম্ভব হল না। মীরা এসে বলল, দাদা শুনেছিস, মেজো খালু সাহেব মারা গেছেন।

আমি অসম্ভব অবাক এবং দুঃখিত হবার ভাব করলাম। যেন পৃথিবীর সবচে' ভয়াবহ খবর এইমাত্র শুনলাম। দুঃখের ভাবটাকে আরো জোরালো করার জন্যে কিছু-একটা বলা দরকার। যেমন করুণ গলায় বলা, হোয়াট এ ট্রাজেডি' কিংবা 'কি সর্বনাশ'! এই দু'টার মধ্যে কোনটা বলব ভাবছি, তখন মীরা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তুই আবার আমার ব্রাস দিয়ে দাঁত ঘসছিস? আবার? যেন এটাই বর্তমান সময়ের গ্রেট ট্রাজেডি। মেজো খালু সাহেবের মৃত্যু চাপা পড়ে গেল। আমি উদাসিন ভঙ্গিতে বললাম,

'এটা তোর নাকি?

'ব্রাসের গায়ে এম লেখা দেখছিস না? গতকালও আমার ব্রাস দিয়ে দাঁত মাজলি। এইসব কি?

'গতকাল তোর ব্রাস দিয়ে দাঁত মাজলাম? তুই বুঝলি কি করে?'

'সিগারেটের গন্ধ থেকে বুঝেছি। ভক ভক করে সিগারেটের গন্ধ বের হয়।'

মীরার দিকে তাকিয়ে মনে হল সে কেঁদে ফেলার একটা চেষ্টা করছে। আমার দুই বোন কাঁদার ব্যাপারে খুব এক্সপার্ট। অতি তুচ্ছ কারণে এবং সম্পূর্ণ অকারণে এরা কাঁদতে পারে। গত শুক্রবারে টিভি-র একটা নাটক দেখে এরা দু'জনই এমন মায়াকান্না জুড়ে দিল যে বড় চাচা ধমক দিয়ে বললেন — এসব হচ্ছে কি? এই, টিভি বন্ধ করে দে তো। এদের নিয়ে বড় যন্ত্রণা! আসলেই বড় যন্ত্রণা। একই চিরুণী দিয়ে সেও মাথা আঁচড়াচ্ছে, আমিও আঁচড়াচ্ছি, তাতে দোষ হচ্ছে না। ব্রাসের বেলায় একেবারে কেঁদে ফেলতে হবে।

আমি বললাম, কাঁদছিস কেন? কেঁদে ফেলার মত কি হল?

মীরা জবাব না দিয়ে ছুটে বের হয়ে গেল। মীরা বয়সে আমার তিন বছরের ছোট। ওর এখন একুশ চলছে। যদিও চেহারায় খুকী-খুকী ভাবটা রয়ে গেছে। শুধু চেহারায় না, স্বভাবেও। একদিন বাসায় এসেছে কাঁদতে কাঁদতে, কারণ এক রিক্‌শাওয়ালা নাকি তাকে গালি দিয়েছে। বলেছে — এই ছেমরি। একজন রিক্‌শাওয়ালা কি করে মীরার মত অত্যন্ত রূপবতী মেয়েকে এই ছেমরি বলতে পারে সে এক রহস্য। রূপবতীদের গালি দেয়া বেশ কঠিন। তাছাড়া মীরা শুধু রূপবতীই নয়, বাইরের লোকজনদের সঙ্গে তার ব্যবহারও খুব ভাল। কাজের লোক, রিক্‌শাওয়ালা এদের সবাইকে সে আপনি করে বলে। তাকে কেন রিক্‌শাওয়ালা গালি দেবে? মীরা অবশ্যি কিছুই বলল না। সারা বিকাল ফুঁপাল।

নাসতার টেবিলে মা বললেন, তোর মেজো খালু মারা গেছেন, শুনেছিস? আমি নিস্পৃহ গলায় বললাম, হুঁ।

দুঃখিত, ব্যথিত হবার ভঙ্গি মা'র সামনে করলাম না। এক বিষয় নিয়ে দু'বার অভিনয় করার কোন মানে হয় না।

মা বললেন রাত তিনটার সময় মারা গেলেন। ঘুমুচ্ছিলেন, হঠাৎ জেগে উঠে বললেন, ফরিদা, এক গ্লাস পানি দাও। ফরিদা পানি এনে দিল। পানি খেয়ে বললেন, মেয়েটাকে ঘুম থেকে ডেকে তোল। ফরিদা বলল, মেয়েকে ডাকার দরকার কি? তোর মেজো খালু বললেন — শরীরটা ভাল লাগছে না। তখন তাঁর খুব ঘাম হতে লাগল। তারপর . . .

মা নিপুণ ভঙ্গিতে মৃত্যু-সময়কার খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো বলতে লাগলেন। এতসব খুঁটিনাটি তিনি কোত্থেকে জোগাড় করলেন কে জানে! আমি লক্ষ্য করেছি, মৃত্যু-বিষয়ক খুঁটিনাটি মেয়েরা খুব আগ্রহ করে বলে।

'তোর খালুর ঘাম দেখে ফরিদা বলল, এত ঘামছ কেন? গরম লাগছে? তোর খালু বললেন, একটা ভেজা তোয়ালে দাও . . .'

আমি মা'কে থামিয়ে দিয়ে বললাম, এত খবর পেলে কোথায়?

মা'র চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে গেল। তাঁকে কোন প্রশ্ন করলেই তিনি মনে করেন তাঁকে বিপদে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। তখন অসম্ভব রেগে যান। এই ভোরবেলাতেই মা'কে রাগিয়ে দেবার কোন মানে হয় না। আমি আগের প্রশ্ন ধামাচাপা দিয়ে বললাম, বেচারা অল্প বয়সে মারা গেল। তুমি যাচ্ছ ও বাড়িতে?

মা আৎকে উঠে বললেন, সংসার ফেলে আমি যাব কি করে? তোর ছোটচাচীর আবার ব্যথা উঠেছে।

'তাই নাকি?'

'সারারাতই তো ব্যথায় ছটফট করল। খবর রাখিস না — নাকি? হাসপাতালে নিতে হবে মনে হয়। তোর ছোটচাচা বলছিল দুপুর নাগাদ ব্যথা না কমলে হাসপাতালে নিয়ে যাবে।'

'আমি শুকনা গলায় বললাম — ও'

ছোট চাচীর ব্যথা হচ্ছে নিত্যদিনকার একটা ব্যাপার। এই খবরে শুকনো 'ও' ছাড়া কিছু বলা যায় না। ছোটচাচীর ব্যথা এবং ব্যথার সঙ্গে জড়িত কুঁ কুঁ কাতরধ্বনির সঙ্গে আমরা এত পরিচিত যে, এখন এসব শুনলে মুখের ভাবভঙ্গির কোন পরিবর্তন হয় না। তবে ছোটচাচীর 'ব্যথা' আমাদের নানান সময়ে নানান উপকার করে। এই যেমন আজ করছে। মা বলতে পারছেন — ছোটচাচীর ব্যথার কারণে তিনি যেতে পারছেন না। যে সমস্ত বিয়ের দাওয়াতে আমাদের যেতে ইচ্ছে করে না আমরা খবর পাঠাই — ছোটচাচীকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলছে। কি যে অবস্থা!

সংসারে একজন সিরিয়াস ধরনের রোগি থাকার অনেক সুবিধা। খুব কাজে লাগে।

অবশ্যি ছোটচাচীর ব্যথার সমস্যা না থাকলেও যে মা মেজো খালার বাসায় যেতেন তা মনে হয় না। ফরিদা খালা মা'র আপন বোন না। খালাতো বোন। যাকে মা খুবই অপছন্দ করেন। শুধু মা একা না, এই মহিলাকে কেউ দেখতে পারে না। সুন্দরী একজন মহিলা, যে খুব চমৎকার করে কথা বলে, তাকে কেন সবাই এত অপছন্দ করে কে জানে? আমার কাছে ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়ই মনে হয়। ভদ্রমহিলার কথাবার্তা ভাল। বেশ আদুরে ভঙ্গি আছে। বাসায় গেলে প্রচুর খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করেন। তবু কেউ তাঁকে দেখতে পারে না।

আসলে অপছন্দ করা উচিত মেজো খালুকে। ভদ্রলোক দেখতে কোলা ব্যাঙের মত। মুখের হা-টা অনেক বড় বলে যখনই হাসেন তখনই আলজিভ দেখা যায়। হাসির সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের ভুড়ি লাফালাফি করে। কুৎসিত দৃশ্য। স্বভাবটাও কুৎসিত। অসম্ভব কৃপণ। আটচল্লিশ বছর বয়সেই বাড়ি গাড়ি করে হুলস্থুল করেছেন অথচ হাত দিয়ে একটা পয়সা বের হয় না। আমার বড় বোন ইরার বিয়েতে এসেছিলেন খালি হাতে। অবশ্যি এসেই বললেন — জামাইয়ের জন্যে একটা স্যুটের কাপড় কিনে রেখেছি। জামাইকে একবার পাঠিয়ে দেবেন, দরজির কাছে মাপ দিয়ে আসবে। শুধু শুধু স্যুটের কাপড় দেয়ার কোন অর্থ হয় না। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি, কাপড়ের চেয়ে দরজির খরচ বেশি।

ইরার স্বামী-বেচারা এখনো সেই স্যুট পরতে পারেনি। নতুন জামাই তো আর ঐ বাড়িতে গিয়ে বলতে পারে না — খালুজান, স্যুটের মাপ দিতে এসেছি।

আমার ধারণা, মেজো খালু স্যুটের কাপড়ের কথা বলে প্রচুর বিয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছিলেন। বেঁচে থাকলে হয়তো আরো খেতেন।

না। একজন মৃত মানুষ সম্বন্ধে এইসব ভাবা উচিত না। ভদ্রলোকের নিশ্চয়ই অনেক ভাল গুণ ছিল, আমরা যার খবর রাখি না। একজন মৃত মানুষ সম্পর্কে ভাল ভাল কথা ভাবা দরকার। চায়ের কাপে চিনি মেশাতে মেশাতে অনেক চেষ্টা করলাম ভদ্রলোক সম্পর্কে ভাল কিছু মনে করতে। মনে পড়ল না।

চা শেষ করে উঠতে যাব, মা বললেন — সময় করে একবার ও বাড়িতে যাস তো। কেউ না গেলে খারাপ দেখায়।

আমি বললাম, আচ্ছা। আমাদের বাড়ির সিনিয়ার মানুষদের কোন কথাতেই আমি 'না' বলি না। এতে সবার ধারণা হয়েছে যে, আমি একজন অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্রছেলে, তবে কিঞ্চিৎ বোকা। বোকা না হলে কেউ কি আর সব কথাতেই হ্যাঁ বলে? অবশ্যি এমনিতেও আমি আমার বুদ্ধিমত্তার তেমন কোন প্রমাণ দেখাতে পারি না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বি. এ. পাস করে বর্তমানে নাইট সেকশনে 'ল' পড়ছি। কেন পড়ছি নিজেও জানি না। 'ল' পাশ করে কোর্টে গিয়ে ফাটাফাটি করব এই জাতীয় দিবাস্বপ্ন আমার নেই। পড়তে হয় বলে পড়া। শুনেছি 'ল'তে ভর্তি হয়ে থাকলে দু'-তিন বছর পর আপনা-আপনি ডিগ্রী হয়ে যায়। সেই ভরসাতেই আছি। বাড়ির অন্যদেরও আমার ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ নেই। আমার সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব হচ্ছে — করুক যা ইচ্ছা, কোন ঝামেলা তো করছে না। বেচারা আছে নিজের মত।

আমাদের বাড়ির লোকজনদের কিছু পরিচয় দেয়া মনে হয় দরকার। এ বাড়ির সবচে' সিনিয়র এবং সবচে' নির্বোধ ব্যক্তি হচ্ছেন আমার বড় চাচা। বয়স তেষট্টি। দৈত্যের মত শরীর। যাকে বলে বৃষ-স্কন্ধ। এখনো নিয়ম ধরে একসারসাইজ করেন। ভোরবেলা ছোলা এবং মধু খান। রাতে ঘুমুবার আগে যোগব্যায়াম করেন। তাঁর তিন মেয়ে। তিনজন থাকে আমেরিকায়। বিয়ে করে বাড়ি-টারি বানিয়ে সুখে আছে বলা যেতে পারে। বড় চাচী গ্রীনকার্ড নাকি কি যেন পেয়েছেন। বছরের বেশির ভাগ সময় মেয়েদের সঙ্গে থাকেন। মাঝে মাঝে দেশে আসেন।

বড় চাচা ফিলসফিতে এম.এ.। অধ্যাপনা করতেন; বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন। ফিলসফি বিষয়টাতেই সম্ভবত কোন গণ্ডগোল আছে। এই বিষয় নিয়ে বেশিদিন পড়াশোনা করলেই লোকজন খানিকটা নির্বোধ হয়ে যায় বলে আমার ধারণা। বড় চাচা যেমন হয়েছেন। তবে নিজের সম্পর্কে তাঁর ধারণা অতি উচ্চ। ভাল খাওয়া-দাওয়া তাঁর খুবই পছন্দ। যদিও গত দু'মাস ধরে নিরামিষ খাচ্ছেন। কোথায় নাকি পড়েছেন নিরামিষ খেলে শরীরে ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয়। এখন সেই চেষ্টাই করছেন। আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, শরীরে ইলেকট্রিসিটি হলে লাভ কি? বড় চাচা তার উত্তরে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যার অর্থ — 'এই গাধা বলে কি!'

শরীরে ইলেকট্রিসিটি তৈরি করা ছাড়াও সাধু-সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানেও তিনি বেশ কিছু সময় ব্যয় করেন।